# অধ্যায় - ৬

রাম নবমীর উৎসব, মস্‌জিদের জীর্ণতা সংস্কার, গুরুর করস্পর্শের মহিমা, চন্দন সমারোহ, উর্স এবং রামনবমীর সমন্বয়।

## গুরুর করস্পর্শের গুণ

যখন সদ্‌গুরুই নৌকার নাবিক, তখন তিনি নিশ্চয়ই নির্বিঘ্নে ও সহজেই এই ভবসাগর পার করিয়ে দেবেন। 'সদ্‌গুরু' শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্রই শ্রী সাইবাবার কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন তিনি স্বয়ং আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমার মাথায় উদী লাগিয়ে দিচ্ছেন। আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। চোখ থেকে প্রেমাশ্রু বয়ে যাচ্ছে। সদ্‌গুরুর করস্পর্শের শক্তি মহান ও আশ্চর্য্যজনক। যে সূক্ষ্ম শরীর, সমগ্র সংসারকে ভস্ম করে দিতে পারে এমন অগ্নি দ্বারাও নষ্ট হয় না, সেটাই গুরুর হাতের স্পর্শে এক নিমেষে নষ্ট হয়ে যায়। শ্রী সাইবাবার মনোরম রূপের দর্শন করে গলা রুদ্ধ হয়ে যায়, চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। যখন হৃদয় ভাবান্বিত হয়ে যায়, তখন 'আমিই সে' (সোহহম্‌) ভাব জাগৃত হয়ে আত্মানুভূতির আনন্দের আভাস হয়। 'আমি' আর 'তুমি'-র পার্থক্য (দ্বৈত ভাব) নষ্ট হয়ে যায় এবং ততক্ষণাৎ ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা অনুভব হয়। যখন আমি কোন ধার্মিক গ্রন্থ পাঠ করি, তখন প্রতিপদে সদ্‌গুরুর স্মৃতি মনে জেগে ওঠে। বাবা শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ রূপে তাঁর জীবন-গাথা শুনিয়ে যান। যখন আমি ভাগবৎ পাঠ শ্রবণ করি, তখন বাবা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ধারণ করেন এবং এইরূপ মনে হয় যেন তিনিই ভক্তদের কল্যাণ হেতু উদ্ধবগীতা শোনাচ্ছেন। কারো সঙ্গে আলোচনা করার সময় আমি বাবার কথাগুলি স্মরণ করি, যাঁতে উপযুক্ত অর্থ বোঝাতে সফল হতে পারি। নিজে থেকে যখন কিছু লিখতে যাই ঠিক সেই সময় একটা শব্দ বা বাক্যও রচনা করে উঠতে পারি না। কিন্তু যখন বাবা স্বয়ং কৃপা করে আমাকে দিয়ে লেখাতে শুরু করেন, তখন তার আর কোন শেষ থাকে না। যখন ভক্তদের মধ্যে অহংকার বাড়তে শুরু করে, তখন বাবা নিজের হাতে তা দমন করেন এবং নিজের শক্তি প্রদান করে তাকে অহংকারশূণ্য করে চরম লক্ষের প্রাপ্তি করিয়ে দেন। সে পরম সন্তুষ্ট হয়ে অক্ষয় সুখের অধিকারী হয়ে যায়। যে বাবাকে নমন করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর শরণে যায়, তার আর

**অন্য কোন সাধনার আবশ্যকতা থাকে না। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সে সহজেই পেয়ে যায়।** ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার চারটি মার্গের (কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি) মধ্যে ভক্তি মার্গ সবচেয়ে বেশী কন্টকাকীর্ণ এবং খানা-খন্দ দিয়ে ভরা। কিন্তু যদি সদ্‌গুরুর উপর বিশ্বাস থাকে এবং পথের গহ্বর থেকে সাবধান হয়ে তাঁর পদানুক্রমণ করে সোজা এগিয়ে যাও, তাহলে সেই চরম লক্ষ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট সহজেই পৌঁছে যাবে। শ্রী সাইবাবা বলেছেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম এবং তাঁর বিশ্ব উৎপত্তি, রক্ষণ ও লয় করার বিভিন্ন শক্তিগুলির পৃথকত্ত্বর মধ্যেও একাত্মতা আছে। এই কথাটি বিভিন্ন গ্রন্থকারেরাও লিখেছেন। ভক্তদের কল্যাণের জন্য শ্রী সাইবাবা স্বয়ং যে শব্দগুলির দ্বারা আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেটাই এখানে লেখা হচ্ছে। **"আমার ভক্তদের বাড়ীতে অন্ন-বস্ত্রের কখনো অভাব হবে না। আমার এই বৈশিষ্ট্য যে, যে ভক্ত আমার শরণে আসে এবং কায়মনোবাক্যে আমারই উপাসনা করে, তাঁর কল্যাণের জন্য আমি সর্বদা চিন্তিত থাকি** । কৃষ্ণ ভগবান গীতাতে এই কথাই বুঝিয়েছেন- সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িষ্যামি মা শুচঃ - (গীতা ১৮/৬৬)। তাই খাওয়া-পরার কথা বেশী চিন্তা কোরো না। যদি কিছু চাইবার অভিলাষ থাকে তাহলে ঈশ্বরকেই চেয়ে নাও। জাগতিক সম্মান বা উপাধি ছেড়ে ঈশ্বরের কৃপা ও অভয়দান প্রাপ্ত করো এবং তাঁরদ্বারাই সম্মানিত হওয়ার চেষ্টা করো। সাংসারিক সাধনায় কুপথগামী হয়ো না। নিজের ইষ্টকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো। কোন পদার্থদ্বারা আকর্ষিত হয়ো না, সর্বদা আমার ধ্যানেই মন নিযুক্ত রাখো যাতে সে দেহ, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি প্রবৃত্ত না হয়। এইভাবে চিত্ত স্থির, শান্ত ও নির্ভয় হয়ে যাবে। এই ধরনের মনঃস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে, মন সুসঙ্গতিতে। আছে। যদি মনের চঞ্চলতাই দূর না হয়, তাহলে তাকে একাগ্র করা যায় না।"

এরপর গ্রন্থকার শিরডীতে রামনবমী উৎসব বর্ণনা করেছেন। শিরডীতে রামনবমী খুব ঘটা করে পালন করা হয় এবং এটি সেখানকার প্রধান উৎসব। অতএব এই উৎসবের সম্পূর্ণ বিবরণ, যেমনটি সাইলীলা পত্রিকার (১৯২৫) ১৯৭ পৃষ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল, নিম্নে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে ঃ-

**প্রারম্ভ**

কোপরগ্রামে শ্রী গোপালরাও গুন্ড নামক এক ইনস্‌পেক্টর থাকতেন এবং উনি বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রী সাইবাবার কৃপায় উনি একটি পুত্র রত্ন প্রাপ্ত করেন (ওঁর তিনটি স্ত্রী ছিল, কিন্তু তখনো অবধি কোন সন্তান হয়নি)। সেই আনন্দে ১৮৯৭

সালে ওঁর মনে হয় যে শিরডীতে মেলা অথবা উর্স ভরানো উচিত (উর্স শিরডীবাসীদের নিজেদের গ্রামদেবীর চরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করার অনুষ্ঠান)। উনি এই কথাটি অন্যান্য ভক্তদের, যেমন- তাত্য়া পাটীল ও মাধবরাওকেও বলেন। ওঁদের সবারই এই পরিকল্পনাটি অতি মর্মস্পর্শী মনে হয় এবং ওরা খুব শীঘ্র বাবার অনুমতি ও আশ্বাসও পেয়ে যান। এইবার কালেক্টরের কাছে একটি প্রার্থনা পত্র পাঠানো হয়। কিন্তু তার আপত্তি করায় স্বীকৃতি পাওয়া গেল না। কিন্তু বাবা তো আগেই আশ্বাস দিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব আবার চেষ্টা করাতে স্বীকৃতি পাওয়া গেল। বাবার আদেশ অনুসারে রামনবমীর দিন মেলা হওয়া (বা উর্স ভরা) স্থির হয়। পরবর্তীকালের ঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় যে, বাবা যেন কোন একটা বিশেষ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে এমন আদেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ উর্স এবং রামনবমী উৎসবের একাকীকরণ এবং হিন্দু-মুসলিম একতা। এই বিশেষ ব্যবস্থাটি পূর্ণ রূপে সফল হয়।

প্রথম বাধা তো কোন রকমে কাটল। এবার দ্বিতীয় সমস্যার (জলের অভাব) সম্মুখীন হতে হল। সে সময় শিরডী একটি ছোট্ট গ্রাম ছিল এবং বরাবরই সেখানে জলের সমস্যা থাকত। গ্রামে শুধু দুটোই কূয়ো ছিল। তার মধ্যে একটা তো প্রায় শুকিয়েই গিয়েছিল ও অন্যটার জল ছিল নোন্‌তা। বাবা তাতে ফুল ঢেলে তার জল মিষ্টি করে দিলেন। কিন্তু একটা কূয়োর জল কতজনের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে? তাই তাত্য়া পাটীল বাইরে থেকে জল আনবার ব্যবস্থা করলেন। বাঁশের ও কাঠের দোকান বানানো হল। কুস্তিরও আয়োজন করা হলো। গোপালরাও গুন্ডের এক বন্ধু দামু অন্না কাসার আহমদনগরে থাকতেন। তিনিও সন্তানহীন হওয়ার দরুণ মনোকষ্টে ভুগছিলেন। শ্রী সাইবাবার কৃপায় উনিও সন্তান সুখ প্রাপ্ত করেন। শ্রী গুন্ড ওঁকে এই উপলক্ষে একটা ধ্বজা দিতে বলেন। একটা ধ্বজা জমিদার শ্রী নানাসাহেব নিমোন্‌কর দেন। এই দুটি ধ্বজা খুব ধূমধাম করে গ্রামের বাইরে মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হলো এবং শেষে মস্‌জিদের (যাকে বাবা দ্বারকামাই বলে ডাকতেন) কোণে লাগিয়ে দেওয়া হলো। এই সমারোহটি এখনো আগের মতই চলছে।

### চন্দন সমারোহ

এই মেলাতে আরেকটি সমারোহও শুরু হয়, যেটি চন্দনোৎসব নামে প্রসিদ্ধ। এর পরিকল্পনা কোরহলের এক মুসলমান ভক্ত শ্রী অমীর শক্কর দালাল করেন। এই ধরনের উৎসব সাধারনতঃ সিদ্ধ মুসলমান সন্তদের সম্মানে করা হয়। অনেকটা চন্দন ঘষে, অনেকগুলি চন্দন ধূপ থালাতে জ্বালিয়ে মিছিল বার করা হত। সব শেষে মস্‌জিদে

এইগুলি পৌঁছিয়ে সমারোহ শেষ হয়ে যেত। থালার চন্দন এবং ধূপ নিমের উপর এবং মস্‌জিদের দেওয়ালের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হত। এই উৎসবের ব্যবস্থা প্রথম তিন বছর আমীর শক্কর করেন। তারপর তাঁর স্ত্রী এর ভার নেন। এইভাবে হিন্দুদের দ্বারা ধ্বজার ও মুসলমানদের দ্বারা চন্দনের শোভাযাত্রা এক সাথে বেরোত এবং আজ অবধি সেইভাবেই বেরোয়।

**প্রবন্ধ**

রামনবমীর দিনটি শ্রী সাইবাবার ভক্তদের জন্য অতিশয় প্রিয় ও পবিত্র। মেলায় সহযোগিতা ও কাজ করার জন্য অনেক লোকেরা প্রস্তুত থাকত। বাইরের সমস্ত কাজ শ্রী তাত্য়া পাটীল ও বাকী কাজগুলি শ্রী সাইবাবার এক পরম ভক্ত রাধাকৃষ্ণমাই সামলাতেন। এই সময় ওঁর বাড়ী অতিথিতে ভরে যেত এবং উনি সবার আরামের প্রতি নজর রাখতেন। মেলায় প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুগুলি আয়োজন করে রাখতেন। ওঁর আরেকটা কাজ ছিল, যেটা তিনি সানন্দে করতেন- সেটা হলো মস্‌জিদটিকে পরিস্কার করা ও চূণ লেপা। মস্‌জিদের মেঝে ও দেওয়াল ধুনির ধোঁয়াতে কালো হয়ে যেত। যে সময় বাবা চাওড়ীতে বিশ্রাম করতে যেতেন, সেই সময় রাধাকৃষ্ণমাই মস্‌জিদ পরিস্কার করে নিতেন। সমস্ত জিনিষগুলি ধুনি সমেত বাইরে বার করতে হতো। পরিস্কার ও চুনকামের কাজ হয়ে যাওয়ার পর আবার সেগুলি সাজিয়ে দিতেন।

এই উৎসবের একটা প্রধান অংশ ছিল গরীবদের খাবার খাওয়ান- বাবার খুবই প্রিয় অনুষ্ঠান। এর জন্য বৃহৎ ভোজের আয়োজন করা হতো এবং নানা রকমের মিষ্টান্ন তৈরী করা হতো। এই সব ব্যবস্থাগুলি রাধাকৃষ্ণমাইয়ের বাড়ীতে ওঁর তত্ত্বাবধানেই করা হতো। অনেক ধনী ভক্তরা এই কাজের নিমিত্তে আর্থিক সাহায্য প্রদান করত।

**উর্স ও রামনবমীর উৎসবের সমন্বয়**

সব ব্যবস্থা ও কাজ এইভাবে উত্তমরূপে চলছিল ও মেলার প্রসিদ্ধি ধীরে-ধীরে বাড়ছিল। ১৯১১ সালে একটা পরিবর্তণ ঘটে। এক ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণরাও জোগেশ্বর ভীষ্ম (শ্রী সাইসগুনোপসনার লেখক) শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডের সঙ্গে মেলার একদিন আগে দীক্ষিত ওয়াড়ায় এসে উঠলেন। এক সময় বারান্দায় শুয়ে-শুয়ে ওঁর একটা কথা মনে হয়। ঠিক সেই সময় কাকা মহাজনী পূজোর সামগ্রী নিয়ে মস্‌জিদের দিকে যাচ্ছিলেন। ওঁদের মধ্যে কিছু আলোচনা হয় এবং এটাই বোঝা যায় যে মেলা ঠিক রামনবমীর দিনই হওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য লুক্কায়িত আছে। রামনবমীর দিনটি হিন্দুদের

জন্য খুবই প্রিয়। এই দিন যদি রামনবমী উৎসবও (অর্থাৎ শ্রী রামের জন্মের) শুরু করে দেওয়া হয় তো কেমন হয়? কাকা মহাজনীর এই পরিকল্পনাটি খুব ভাল লাগে। এখন শুধু বাকী রইল একটি হরিদাস খোঁজা- যে এই উপলক্ষে হরিকীর্তন ও ঈশ্বর গুণানুবাদ করতে পারে। এই বাধাটাও কেটে গেল যখন ভীষ্ম বললেন- "আমার স্বরচিত রাম আখ্যান' যাতে রামজন্মের বর্ণনা আছে, লেখা হয়ে গেছে। আমি তারই কীর্তন করব এবং তুমি হারমোনিয়াম বাজাবে। রাধাকৃষ্ণমাঈ 'সুন্ঠ বড়া'র (আদা ও চিনির মিশ্রণ) প্রসাদ তৈরী করে দেবেন।" এইরূপ আলোচনার পর ঐ দুজনে বাবার স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য মস্‌জিদে গেলেন। বাবা তো অন্তর্যামী। তিনি তো সবই জানতেন যে কি কাথাবার্তা হচ্ছিল। তিনি মহাজনীকে জিজ্ঞাসা করলেন- "দীক্ষিত ওয়াড়াতে কি সব চলছিল?" এই আকস্মিক প্রশ্ন শুনে মহাজনী একটু ঘাবড়ে যান। বাবার কথার অভিপ্রায় না বুঝতে পারার দরুণ উনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন বাবা ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন- "কি ব্যাপার?' ভীষ্ম তখন রামনবমী উৎসবের প্রস্তাবটা বাবার সামনে রাখেন ও বাবার অনুমতির জন্য প্রার্থনা করেন। বাবাও সহর্ষে অনুমতি দিয়ে দেন। সব ভক্তরাই খুব খুশী হয় এবং রামজন্মোৎসবের তোড়-জোড় শুরু হয়ে গেল। পরের দিনই নানা রঙের পতাকা দিয়ে মস্‌জিদ সাজিয়ে দেওয়া হলো। শ্রীমতী রাধাকৃষ্ণমাঈ একটা দোলনা আনিয়ে বাবার সামনে রাখিয়ে দিলেন। এর পর উৎসব শুরু হলো। ভীষ্ম কীর্তন গাইতে শুরু করেন ও মহাজনী তার সাথে হারমোনিয়াম বাজান। ঠিক এই সময় বাবা মহাজনীকে ডেকে পাঠান। মহাজনী একটু শঙ্কিতবোধ করেন যে, বাবা বোধ হয় উৎসবের অনুমতি দেবেন না। কিন্তু উনি যখন বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ান, তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "এসব কি? এই দোলনাটা এখানে কেন রাখা হয়েছে?" মহাজনী তাঁকে জানান যে রামনবমীর উৎসব শুরু হয়ে গেছে এবং তাই দোলনাটা সেখানে রাখা হয়েছে। বাবা দুটো মালা নিয়ে একটা কাকাজীর গলায় পরিয়ে দেন এবং অন্যটা ভীষ্মর জন্য পাঠিয়ে দেন। এবার আবার কীর্তন শুরু হল। কীর্তন শেষ হলে শ্রী রাজারামের জয়জয়কার ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কীর্তনের জায়গায় আবীর ওড়ানো হলো। সবাই আনন্দে মত্ত ছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা গর্জন শোনা গেল। যে সময় আবীর ছোঁড়া হচ্ছিল, একটু আবীর বাবার চোখে অনায়াসেই চলে যায়। বাবা তাতে একদম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং জোরে-জোরে অপশব্দ বলতে শুরু করেন। এই দৃশ্য দেখে সবাই ভয়ে এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যারা বাবার স্বভাবের সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিল তারা এই অপশব্দ শুনে ভয়ভীত হবে কেমন করে? বাবার এই ক্রোধ ও অপশব্দ তারা আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করলো। তাদের মনে

হলো- "আজ রামের জন্মদিন অর্থাৎ রাবনের বিনাশ, অহংকার ও দুষ্ট প্রবৃত্তি রূপী রাক্ষসদের সংহার করার জন্য বাবার ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক।" এছাড়া তারা এও জানত যে যখনই শিরডীতে কোন নতুন কাজ শুরু করা হতো তখন বাবা এইরকমই রেগে যেতেন। তাই তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে রাধাকৃষ্ণমাঈ ভয় পাচ্ছিলেন যে, বাবা রাগের চোটে দোলনাটাই না ভেঙ্গে ফেলেন। তাই তিনি মহাজনীকে দোলনাটা সরিয়ে নিতে বললেন। কিন্তু বাবা কাকাজীকে তা করতে দিলেন না। কিছুক্ষণ পর বাবা শান্ত হন। সেইদিনের মহাপূজো ও আরতি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। এরপর কাকা মহাজনী দোলনাটি সরিয়ে নেবার জন্য বাবার কাছে অনুমতি চান। কিন্তু বাবা বললেন- "উৎসব এখনও শেষ হয়নি।" পরের দিন গোপালকালা উৎসবের পর বাবা দোলনাটি নামাবার অনুমতি দেন। একটা মাটির পাত্রে দৈ-চিঁড়ে রেখে সেটা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলো। কীর্তন শেষ হওয়ার পর পাত্রটি ভেঙ্গে দৈ-চিঁড়ে প্রসাদ রূপে বিতরণ করা হল, যেমনটি শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সঙ্গে করেছিলেন। রামনবমীর উৎসব এইভাবে সারা দিন ধরে চলল। দিনের বেলা দুটো ধ্বজার শোভাযাত্রা ও রাত্রিতে চন্দনের মিছিল খুব ঘটা করে বেরোল। এরপর 'উর্স' রামনবমীর উৎসবে রূপান্তরিত হল। পরের বছর (১৯১২) থেকে উৎসবের ঘটা ও কার্য্যক্রমগুলো বাড়তে লাগল। শ্রীমতি রাধাকৃষ্ণমাঈ চৈত্র প্রতিপদ থেকে 'নাম সপ্তাহ' আরম্ভ করে দিলেন (দিন রাত অনবরত সাত দিন অবধি ভগবদ্ নাম নেওয়াকে নাম সপ্তাহ বলে)। সব ভক্তরা পালা করে এতে অংশ গ্রহণ করতেন। দেশের সব জায়গাতেই রামনবমীর উৎসব পালন করা হয়। তাই পরের বছর আবার হরিদাসের ব্যবস্থা করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু উৎসবের দিনের আগেই তার সমাধানও খুঁজে পাওয়া গেল। পাঁচ-ছদিন আগে হঠাৎ শ্রী মহাজনীর বালা বুয়ার সাথে দেখা হয়। বুয়া সাহেব 'আধুনিক তুকারাম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হরিকীর্তন করার দায়িত্ব তাঁর উপরেই দেওয়া হয়। তার পরের বছরও ওঁর গ্রামে প্লেগ ছড়ানোর দরুণ তিনি নিজের গ্রামে হরিদাসের কাজ করতে না পারায় শিরডীতে চলে আসেন। কাকাসাহেব দীক্ষিত ওঁকে কীর্তনের ভার দেওয়ার জন্য বাবার কাছে অনুমতি চান। বাবা অনুমতির সাথে-সাথে বুয়াকে যথেষ্ট পুরস্কারও দেন। ১৯১৪ সালে বাবা হরিদাসের সমস্যাটি পুরোপুরি মিটিয়ে দেন। তিনি এই কাজটির ভার দাসগণু মহারাজকে দেন। সেই থেকে দাসগণু মহারাজ এই কাজটি পূর্ণ উৎসাহের সাথে পালন করেন। ১৯১২ থেকে উৎসবে ভক্তদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। প্রসিদ্ধ পালোয়ানদের কুস্তি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। গরীবদের জন্য খুব বড় ভাবে খাওয়ার আয়োজন করা হতো। রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের ঘোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ শিরডী সংস্থানের রূপ অর্জন

করল। সংস্থানের সম্পত্তিও দিন-প্রতিদিন বাড়তে লাগল। একটা সুন্দর ঘোড়া, পাল্কী, রথ এবং রূপোর অন্যান্য জিনিষ ও বাসন-পত্র ইত্যাদি ভক্তরা উপহার রূপে অর্পণ করতেন। এই অবসরে হাতিও ডাকা হতো। যদিও সম্পত্তিতে দিনের-পর-দিন বৃদ্ধি হচ্ছিল, বাবা সে সব থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ থাকতেন। তিনি এই সব জিনিষ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং সব সময় সাধারণ বেশভূষা ধারণ করে থাকতেন। মিছিল এবং উৎসবে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে কাজ করত, কিন্তু আজ অবধি তাদের মধ্যে কোন বিবাদ বা মতভেদ ঘটেনি - এই কথাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম-প্রথম লোকেদের সংখ্যা পাঁচ-সাত হাজারই হত। কিন্তু পরের দিকে এই সংখ্যা পঁচাত্তর-আশী হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। আজকাল ত এইদিন লক্ষাধিক ভক্তরা শিরডীতে সম্মিলিত হয়। তবুও আজ অবধি না তো কোন রোগ আর নাই কোন ঝগড়া দেখা দিয়েছে।

### মস্‌জিদের জীর্ণতা সংস্কার

'উর্স' ভরার (মেলা শুরু করার) বিচারটি যেমন সর্বপ্রথম শ্রী গোপালরাও গুন্ডের মাথায় জাগে ঠিক তেমনিই মস্‌জিদের জীর্ণতা সংস্কারের পরিকল্পনাও তাঁর মাথাতেই আগে আসে। এই কাজের নিমিত্তে তিনি পাথর একত্রিত করান ও তা বর্গাকার করান। কিন্তু এই কাজের খ্যাতি তাঁর ভাগ্যে লেখা ছিল না। সেটি নানাসাহেব চাঁদোরকরের ভাগে পড়ে ও মেঝে বানানোর নাম কাকাসাহেব দীক্ষিত পান। প্রথমে বাবা এই কাজের জন্য অনুমতি দেননি। কিন্তু স্থানীয় ভক্ত মহালসাপতির প্রয়াসে স্বীকৃতি পাওয়া যায় এবং এক রাত্তিরেই মেঝে তৈরী হয়ে যায়। তখন অবধি বাবা একটা টাটের টুকরোর উপরে বসতেন। এবার এই টাটের টুকরোটি সরিয়ে সেখানে একটা ছোট গদী রাখা হলো। মস্‌জিদের উঠোনটা খুব ছোট্ট ও অসুবিধেজনক ছিল। কাকাসাহেব দীক্ষিত সেটা বাড়িয়ে তার উপর ছাত নির্মাণ করতে চাইলেন। যথেষ্ট দ্রব্য, বাঁশ ইত্যাদি কিনে আনা হল। কাজও শুরু হয়ে গেল। দিনরাত পরিশ্রম করে ভক্তরা লোহার শিকগুলি মাটিতে গাঁথল। পরের দিন চাওড়ী থেকে ফেরার পর বাবা সেগুলি উপড়ে ফেলে দিলেন ও ভীষণ রেগে গেলেন। তাত্যার মাথার কাপড়টা খুলে তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। রাগে বাবার চোখ দুটি লাল হয়ে উঠল। কারো তাঁর দিকে তাকাবার সাহস হচ্ছিল না। সবাই ভাবছিল এইবার কি যে হবে? ভাগোজী শিন্দে (বাবার এক পরম ভক্ত যিনি কুষ্ঠ রোগে ভুগছিলেন) একটু সাহস করে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু বাবা তাঁকেও ধাক্কা দিয়ে পিছনে করে দিলেন। মাধবরাও-এরও ঐ একই দশা হলো। বাবা ওঁর উপরে

ঢিল-পাট্কেল ছুঁড়তে শুরু করেন। যেই ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতে যায়, তারই ঐ দশাই হয়। কিছুক্ষণ পর যখন বাবার রাগ শান্ত হয়, তখন বাবা একটি দোকানদারকে ডেকে একটা জরির কাপড় কিনে নিজের হাতে তাত্য়ার মাথায় বেঁধে দেন, যেন তাকে কোন বিশেষ সম্মান দ্বারা অলংকৃত করা হলো। এই বিচিত্র ব্যবহারটি দেখে সেখানে উপস্থিত সবারই খুব আশ্চর্য লাগে। ওরা বুঝে উঠতে পারছিল না যে বাবা কোন অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ রেগে উঠলেন। তিনি তাত্য়াকে কেনই বা মারলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রাগ কিভাবে আপনা আপনি শান্ত হয়ে গেল? বাবা প্রায়ই গম্ভীর ও চুপচাপ থাকতেন এবং খুবই প্রেমপূর্বক কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু কখনো-কখনো অনায়াসেই ও বিনা কারণে রেগে উঠতেন। এই ধরনের অনেক ঘটনা দেখেছি, কিন্তু আমি এটা স্থির করতে পারছিনা যে তাদের মধ্যে কোন্টা লিখি আর কোন্টা ছাড়ি। তাই ঘটনাগুলি যেমন-যেমন মনে পড়ছে সেই ক্রম অনুসারে বর্ণনা করব। পরবর্তী অধ্যায়ে বাবা হিন্দু ছিলেন না মুসলমান- এই বিষয়ের বিবরণ পাঠকগণ শ্রবণ করবেন।

*।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।*

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ প্রথম বিশ্রাম